অনুসরণকারী

খুলিও কোর্তাসার

স্প্যানিশ থেকে বাংলা তর্জমা
জয়া চৌধুরী

অনুসরণকারী
খুলিও কোর্তাসার
স্প্যানিশ থেকে বাংলা তর্জমা : জয়া চৌধুরী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Anusaronkari by Julio Kortazar translated by Jaya Choudhury Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: September 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97730-4-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

বাণেশ্বর চক্রবর্তী স্যারকে

ভূমিকা

প্যারিসের লা রু মার্তেল রাস্তার ধারে সাত তলার এক বিশাল ফ্ল্যাটে। সে ফ্ল্যাটে চারদিকে ঠাসা বই আর স্তূপাকৃতি মিউজিক ডিস্কের মাঝখানে থাকতেন খুলিও কোর্তাসার। সে ফ্ল্যাটের লিফট ছিল না। সারাদিনে প্রায় সারাক্ষণ ভেতরের ঘরে থাকা রেকর্ড প্লেয়ারে বাজত জ্যাজ সংগীত। তিনি থাকতেন বইয়ের পাহাড়ের মধ্যে। খুলিও কোর্তাসারের জন্ম হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৪ সালে বেলজিয়াম শহরে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে বাবা-মা তাঁকে নিয়ে চলে আসেন পিতৃভূমি আর্জেন্টিনার বুয়েনোস আইরেস শহরের এক মফস্বল অঞ্চলে। সেখানেই বেড়ে ওঠা। প্রখর মেধাবী কোর্তাসার প্রথম উপন্যাসটি লিখে ফেলেছিলেন ন'বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই। যদিও চব্বিশ বছর বয়সে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সাহিত্য—Presencia একটি কাব্যগ্রন্থ। তাও আবার খুলিও ডেনিস ছদ্মনামে। পরিবারের আর্থিক সমস্যার চাপে তাড়াতাড়ি চাকরি শুরু করেন। পরবর্তীকালে একসময় তিনি ফরাসি শিক্ষকের চাকরিও পান। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে আর্জেন্টিনায় প্রচণ্ড রাজনৈতিক ডামাডোল চলছিল। বেশ কয়েকটি সামরিক ও রাজনৈতিক অভ্যুত্থান হয় সেসময়। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যের কোনো এক সময়ে রাজনৈতিক নেতা খুয়ান পেরোনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তারও হন। ১৯৪৬ এই খুয়ান পেরোন সে দেশের রাষ্ট্রপতি হন আরেক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। কিন্তু কোর্তাসার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এই প্রতিদিনকার অস্থিরতার কাছে সাহিত্যিক সত্ত্বাকে বলি দিতে চাননি। তাই অবশেষে ১৯৫২ সালে পাকাপাকিভাবে তিনি ফ্রান্সের নাগরিক হয়ে যান। যদিও সারা জীবন তিনি আর্জেন্টিনার নাগরিকত্বও ছাড়েননি। লাতিন সাহিত্যে বুম যুগে অমর হয়ে আছেন চারজন বরেণ্য সাহিত্যিক—মার্কেস, বোর্খেস, ফুয়েন্তেস, এবং তিনি—খুলিও কোর্তাসার। সংগীতের প্রতি দুর্দম আকর্ষণ ছিল কোর্তাসারের। বিশেষ করে জ্যাজ ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস Rayuela বা এক্কাদোক্কাতেও জ্যাজ এসেছে বিপুলভাবে। এই উপন্যাসের রীতিও ঠিক এক্কাদোক্কার মতোই লাফিয়ে লাফিয়ে। এও তাঁর নীরিক্ষার ফল। সারা জীবন তিনি তাঁর লেখা নিয়ে এই গবেষণা ও প্রয়োগ করেছেন। তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত মানুষদের মধ্যে যেমন গিনসবার্গ ছিলেন অন্যদিকে ছিলেন চে গেভারা। এক

জায়গায় তিনি নিজেকে লাতিন সাহিত্যের 'চে গেভারা' বলে ঘোষণা করতেও ছাড়েননি। এবং এ নিয়ে তন্নিষ্ঠ পাঠক দ্বিমত পোষণ করবেন না বোধহয়।

'অনুসরণকারী' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। পরে এটি তাঁর 'গোপন অস্ত্র' বা 'Las armas secretas' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটিকে কেউ বড়গল্প বলেন কেউ উপন্যাসিকা। কাহিনিটি এগিয়েছে এক বাস্তব চরিত্র মার্কিন জ্যাজ সংগীত বিশারদ চার্লি পার্কারের জীবন উপজীব্য করে। নায়ক 'জনি কার্টার' অর্থাৎ চার্লি পার্কার বহুদিন ধরে জ্যাজ সংগীতের একচ্ছত্র সম্রাট বলেই পরিচিত ছিলেন। জ্যাজ মিউজিকে 'বীবপ' স্টাইলটি নিয়ে আসেন তিনি। আধুনিক জ্যাজের রূপরেখা চার্লি পার্কারই তৈরি করে দেন। বস্তুত এটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসিকা বলার প্রলোভন এড়ানো বেশ শক্ত। কারণ বাস্তবের চার্লির প্রাক্তন স্ত্রী চান এখানে 'লান'-এর চরিত্র, অথবা মৃত কন্যা প্রি এখানে 'বী'-এর চরিত্র, 'মারকেসা তিকা' বাস্তবে ব্রিটিশ ব্যারনেস প্যানোনিকা যিনি বীবপ জ্যাজের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মৃতপ্রায় জ্যাজ সংগীতের পুনরুত্থানে তাঁর অনেকখানি অবদান ছিল। উপন্যাসটিতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে সময়। কোর্তাসার এক আশ্চর্য রীতিতে সময়কে ব্যবহার করেছেন এখানে। সময়কে বোঝার একটি পদ্ধতি হলো ক্রম অর্থাৎ যে ক্রমে ঘটনা ঘটতে থাকে। যা ঘড়ি দিয়ে মাপা যায়। উপন্যাসিকা থেকে একটি লাইন দেখি—"Viajar en el metro es como estar metido en un reloj বা মেট্রোয় চড়া যেন ঘড়ির সঙ্গে আটকে থাকা।" তাছাড়া গোটা উপন্যাসিকাতে প্রচুর কথোপকথন রয়েছে জনি এবং ব্রুনোর মধ্যে যা কিনা বাস্তবকে বোঝায়। আবার একই সঙ্গে জনির মারিজুয়ানা খেয়ে অন্য সময়ে বাস করা, বাস্তব থেকে একরকম পলায়ন, কোনো ভৌগোলিক সীমায় তাকে ধরা যায় না। বহু সময়ই জনি ঘটনাস্থলে থাকছে না অথচ সবকিছুই তার অস্তিত্বকে সোচ্চারে দেখিয়ে দিচ্ছে। এই চলমানতা এক অনন্য দৃষ্টিকোণ দিয়েছে উপন্যাসিকাকে। এটি লেখা হয়েছে অনেকটা ডায়েরির ভঙ্গিতে অথচ তার প্রয়োগ সমসময়ের আরেক বিখ্যাত উপন্যাস উরুগুয়ের প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিক মারিও বেনেদেত্তির 'La Tregua' বা 'চুক্তি'র থেকে কত আলাদা। সেটিও ডায়েরির ভঙ্গিতেই লেখা। কিন্তু দুই ঔপন্যাসিকের শৈলী একেবারে আলাদা। সাহিত্যিক কোর্তাসার চিরকাল নীরিক্ষা করেছেন তার শৈলী নিয়ে। জীবনের সাধারণ এবং অসাধারণ—এই দুই ধরনের অবস্থানের ভেতরকার সম্পর্ক, তাদের মিল, এবং বৈপরীত্য বারবার উঠে এসেছে তাঁর গদ্যশৈলীতে। আটপৌরে জীবনের মধ্যে ফ্যান্টাসি মিশিয়ে দিয়েছেন বারবার। মনে রাখতে হবে আলোচ্য উপন্যাসিকাটি প্রায় ষাটের দশকের শেষে লেখা। মার্কিন সমাজে হিপি সংস্কৃতি এবং ড্রাগ, মারিজুয়ানার এক প্রচণ্ড প্রভাব তখন। তার আঁচ লাতিন দেশগুলোতেও পড়েছিল। আলোচ্য লেখায় জনি পার্কারের মেট্রোতে স্যাক্সোফোন হারানোর কারণও যে এটাই পাঠক বুঝে যান। উপন্যাসিকায় একসময় জনি কার্টার

অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে একজন মিউজিশিয়ানের জীবনের কনসার্ট, রেকর্ডিং ইত্যাদি বাস্তবের ফাঁদে বন্দি হয়ে থাকার জন্য। এর থেকে সে নিজেকে মুক্তি দেয় কেবল তাঁর সংগীতের অবাস্তব দুনিয়ায় গিয়েই।

বাংলা ভাষায় কোর্তাসার অত্যন্ত কম পঠিত। তাঁকে না জানলে বিশ্বসাহিত্যের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শৈলী আমাদের অনবহিত থেকে যাবে। আমার ক্ষুদ্র সাধ্যে স্প্যানিশ থেকে প্রথমবার বাংলায় তর্জমা করে এটি পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। ভালো লাগলে আনন্দিত হব।

জয়া চৌধুরী
নাগের বাজার, কলকাতা, ২০২৩
jayachoudhury6@gmail.com

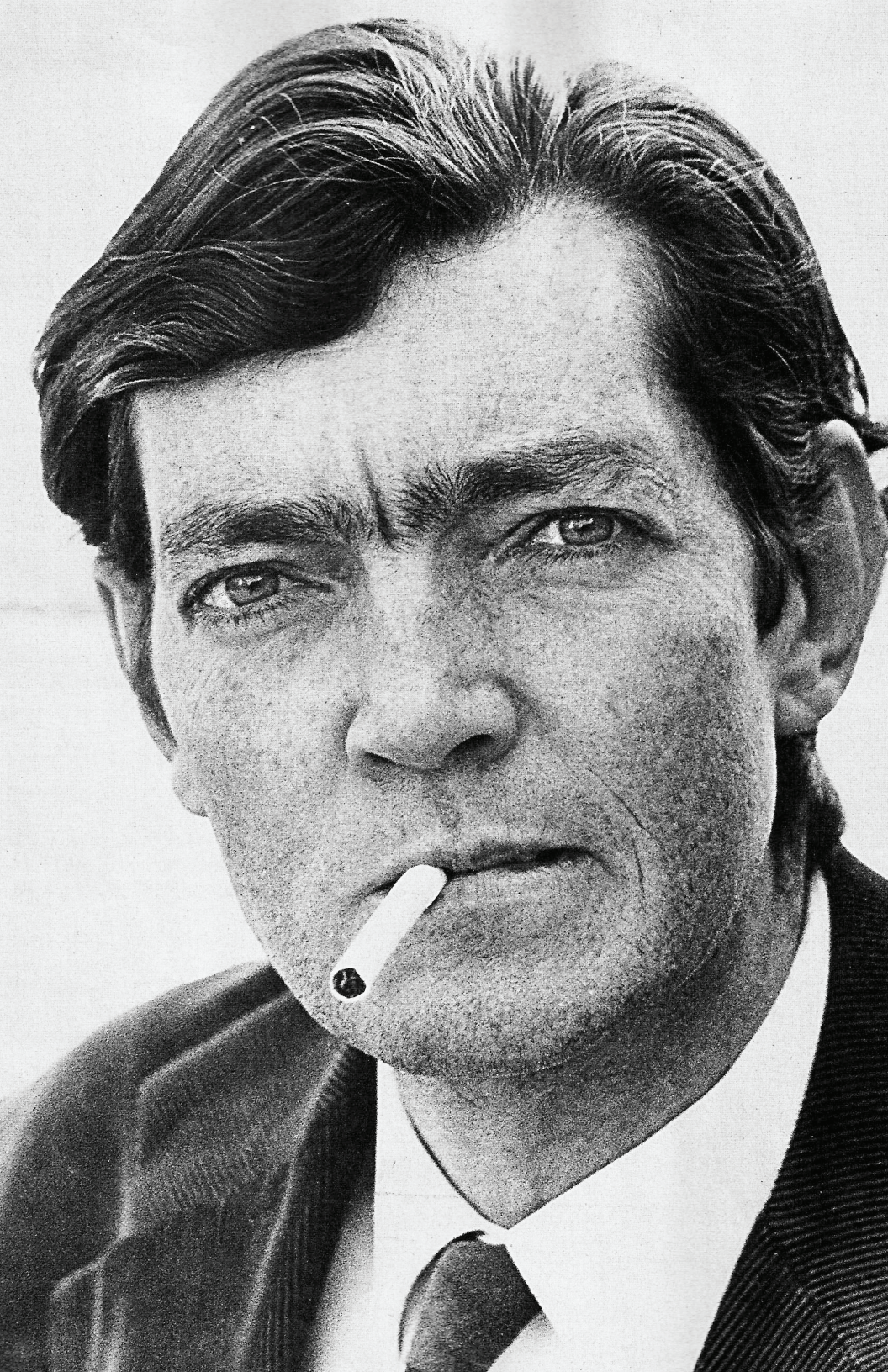

চার্লি পার্কারের স্মৃতিতে

'মৃত্যু অবধি অনুগত থাকব জানি'—অ্যাকোক্যালিপস ২/১০
'অথবা আমাকেই মুখোশ বানিয়ে দিও'—ডিলান টমাস

বিকেলবেলা দেদে ফোন করেছিল। বলল জনির শরীর ভালো নেই। সঙ্গে সঙ্গেই আমি হোটেলে চলে গেলাম। দিন কয়েক হলো দেদে আর জনি রুয়ে লাগ্রাঙ্গের একটা হোটেলে চার তলার একটা ফ্ল্যাটে থাকছে। সে ফ্ল্যাটের দরজা দিয়ে একঝলক চোখ পড়তেই বুঝে গেলাম জনি কী অসম্ভব কষ্টে রয়েছে ওখানে। জানালার সামনেই প্রায় অন্ধকার একটা উঠোন। দুপুর একটার সময়ও কারও মুখ দেখতে গেলে বা খবরের কাগজের পাতা উলটে দেখতে চাইলেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ঠাণ্ডা তেমন নেই। একটা হলুদ উলে বোনা নোংরা চেয়ার। চারদিক থেকে সুতো ঝুলে পড়ছে, সেরকম এক চেয়ারে একটা কম্বলে নিজেকে ভালোরকম মুড়িয়ে জনি বসে রয়েছে। দেদের বয়স হয়ে গেছে। জায়গাটার কমজোরি আলোয় লাল পোশাক পরা ওকে আরও খারাপ দেখাচ্ছে। এটা কাজের জায়গার পোশাক। হোটেলের এই অংশটা কেমন যেন দলাপাকানো বিজাতীয় জিনিসের গুদামে পরিণত হয়েছে।

—ব্রুনো হলো অনুগত সঙ্গী, ঠিক যেমন নিশ্বাসের সঙ্গী দুর্গন্ধ—হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে বসে সম্ভাষণ করার ভঙ্গিতে কথাটা বলেছিল জনি। দেদে আমায় একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলাম। পকেটে করে এক শিশি রাম নিয়ে আসতাম, কিন্তু কী ঘটছে সেটা বোঝার অন্তত আইডিয়াটুকু না আসা পর্যন্ত শিশিটা দেখাতে চাইনি। মনে হয় সবচেয়ে অস্বস্তিকর ছিল ঘরের ল্যাম্প। নোংরা মাছি লেপটানো একটা ল্যাম্প সুতো দিয়ে বাঁধা, ছাদ থেকে ঝুলছিল। দু-একবার তাকাবার পরে হাতটাকে স্ক্রিনের মতো সামনে মেলে ধরে দেদেকে প্রশ্ন করলাম আমরা ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিতে পারি কি না। তারপর জানালার আলোতেই কাজ চালাতে পারি কি না। জনি খুব মন দিয়ে আনমনা হয়ে আমার কথা শুনছিল। ঠিক বিড়াল যেমন করে কোনো দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অথচ তার মাথা অন্য বিষয়ে ঘোরে। সেটা অবশ্য অন্য আর এক বিষয়। শেষমেশ দেদে উঠে আলো নিভিয়ে দিল। তাতে যা পড়ে রইল ধূসর আর কালোয় মাখামাখি হয়ে সেখানেই আমরা পরস্পরকে ভালো করে চিনতে পারলাম। জনি তার রোগা

লম্বা হাত কম্বলের নিচ থেকে বাড়াল আর আমি পরিষ্কার টের পেলাম তার চামড়ার অবসন্ন তিরতিরে উষ্ণতা আঁচ। দেদে বলল কয়েক কাপ নেসকাফে বানাবে। ভালো লাগল এ কথা ভেবে যে তার কাছে অন্তত নেসকাফের শিশি আছে। কারও কাছে যখন নেসকাফের শিশি অন্তত থাকে, বুঝে যাই সে তার দুঃখের একেবারে তলানি অবস্থায় পড়ে নেই। তখনও তার মধ্যে আরও একটু লড়াই করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওকে বললাম—বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ নেই, অন্তত মাসখানেক হবে।

—সময় বলা ছাড়া আমায় আর কিছু বলিসনি।—বেজার মুখে সে উত্তর দিল।—এক, দুই, তিন, একুশ। সব কিছুর সঙ্গে একটা করে নম্বর জুড়ে দিস। এভাবেই সবসময় চলে। কেন রেগে আছি, জানিস? স্যাক্সোফোনটা হারিয়ে ফেলেছি। এতকিছুর পরেও ঠিকই বলিস।

—কিন্তু হারিয়ে ফেললি কী করে?—সঙ্গে সঙ্গে ওকে জিজ্ঞেস করলাম তবে মনে মনে ভাবছিলাম জনিকে এ প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি।

—মেট্রোয়—জনি বলল—আরও নিরাপদে রাখার জন্য ওটাকে বসবার আসনের নিচে রেখেছিলাম। পায়ের নিচে জিনিসটা নিরাপদে আছে সে কথা ভাবলে চলাফেরা করার সময় দারুণ নিশ্চিন্ত লাগে।

—ও সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় খেয়াল করেছিল—একটু ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল দেদে—পাগলের মতো মেট্রো থেকে নেমে দৌড়ে পুলিশকে খবর দিতে গিয়েছিলাম।

পরের ক'মিনিট চুপচাপ থাকার পরে খেয়াল করলাম বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেছে, আর জনি জোরে জোরে হাসতে শুরু করেছে। যেমনটা ও করে থাকে আর কি। ঠোঁট দাঁতের অবস্থানের চাইতে ঢের দূর থেকে উঠে আসা হাসি। বলল—

—কোনো এক অসুখী বেচারা লোক শ্বাস টেনে টেনে শব্দ বের করছে। জীবনে যত স্যাক্সোফোনের আওয়াজ শুনেছি তাদের মধ্যে ওটা সবচেয়ে খারাপ আওয়াজ ছিল। ডক্টর রোদরিগেসকে দেখতাম ওটা বাজাতেন। মনের দিক থেকে একদম ভাঙাচোরা মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন উনি। এমনি যন্ত্র হিসেবে ওটা খারাপ ছিল তেমন নয়। তবে কিনা রোদরিগেসের হাতে এমনকি স্ট্রাদিভারিয়াসের স্যাক্সোফোন দিলেও সুর বাঁধবার অছিলায় ওটা উনি নষ্ট করে ফেলবার ক্ষমতা রাখতেন।

—আর একটা কিনে নিতে পারেননি উনি?

—এটাই আমরা করবার চেষ্টা করছি—দেদে বলল।—রোরি ফ্রেন্ডের কাছে একটা স্যাক্সোফোন থাকতে পারে। বাজে ব্যাপারটা হলো জনির চুক্তির

ব্যাপারটা।...চুক্তির বিষয় যা আছে...তা হলো স্যাক্সোটা বাজানো দরকার। ব্যস এটুকু। আমার নিজের স্যাক্সো নেই আবার নতুন করে একটা স্যাক্সো কেনার টাকাও না। ছেলেদের অবস্থাও আমারই মতো।

এই শেষের ব্যাপারটা নিশ্চিত নয়। তিনটের বিষয়ে আমরা জানি। এবার এখন আর কেউ জনিকে যন্ত্র উপহার দিতে সাহস করবে না। কারণ সেটা হয় সে হারাবে নাহলে অল্পদিনেই ভেঙে ফেলবে। লুই রোলিং থেকে কেনা স্যাক্সোটা জনি বোরদোঁতে হারিয়েছে। ওটা তিন টুকরো করে ভেঙেছে। পায় মাড়িয়ে আছড়ে আছড়ে ভেঙেছে। ইংল্যান্ডে দেদে যখন বেড়াতে গিয়েছিল তখন স্যাক্সোটা কিনেছিল। কেউ জানে না কতগুলো স্যাক্সোর ও কী হাল করেছে। যতগুলো কিনেছে ততগুলোই হয় হারিয়েছে, নয় ভেঙেছে বা কাবাড়িওয়ালাদের কাছে চলে গিয়েছে। আর এই স্যাক্সোগুলোর সবকটা ও বাজাতে পারে। মনে হয় ভগবানই যখন কেবল বড় স্যাক্সোফোন বাজাতে পারেন, ধরে নিচ্ছি তখন সব বীণা আর বাঁশি বেজে ওঠা বন্ধ করে দিয়েছে।

—কখন শুরু করবি জনি?

—জানি না, হয়তো আজকেই। আর দেদে?

—নাহ পরশু শুরু হবে।

—আমি ছাড়া দুনিয়ার সবাই জানে তারিখ—কম্বল দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিতে দিতে গজগজ করে বলে উঠল জনি। শপথ করে বলতে তারিখটা আজকে রাতই ছিল, তাই আজ বিকেলেই আমায় রিহার্সাল দিতে যেতে হতো।

—ব্যাপারটা একই তো হলো—দেদে বলল—প্রশ্নটা হলো ওর স্যাক্সোফোনটাই নেই।

—একই রকম কীরকম? একরকম নয়। পরশুদিন মানে কালকের পরের দিন। আর কালকের দিনটা আজকের অনেক পরে আসবে। এই যে আজ আমরা গল্প করছিলাম, ব্রুনো আর আমি, আমার ঢের বেশি ভালো লাগত যদি এসব ভুলে গিয়ে গরম পানীয়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিতে পারতাম।

—জল ফুটছে, একটু অপেক্ষা কর।

—ফুটলে গরম হবার কথা বলতে হবে না—জনি বলে উঠল।

তখন আমি রামের ফ্লাস্কটা বের করলাম। যেন আগুন জ্বালিয়েছি এমনটাই মনে হচ্ছিল। কারণ জনি তৃপ্তিতে মুখ হাঁ করল। ওর দাঁত ঝিকমিক করে উঠল। ওকে এত চমকে উঠে খুশি হতে দেখে এমনকি দেদের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। নেসকাফের সঙ্গে রাম মেশালে ততটা খারাপ লাগে না খেতে। আর দ্বিতীয় চুমুক দেবার পরে সিগারেটে এক টান দিয়ে উঠেই আমাদের বেশ ভালো লাগতে শুরু

করেছিল। ততক্ষণে খেয়াল করে ফেলেছিলাম যে জনি একটু একটু করে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে ওর হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। যেদিন থেকে ওকে চিনি সেদিন থেকেই এ ব্যাপার নিয়ে ও ব্যতিব্যস্ত। কম মানুষকেই দেখেছি সময় নিয়ে এতখানি উদ্বেগ করতে। এটা একরকম বাতিক আর সমস্ত বাতিকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বাতিক। মানুষের এত রকমের যে বাই থাকে! তবে সেটা ও খোলসা করে দেখায়। এমন মর্যাদা দিয়ে নিজের কাজটা করে, খুব কম লোকই বাতিকের প্রসঙ্গ তুলে সেটা নস্যাৎ করতে পারে। মনে পড়ল সিনসিনাটিতে রেকর্ডিং করার আগে একটা রিহার্সাল হয়েছিল। ঊনপঞ্চাশ বা পঞ্চাশ সালে প্যারিসে আসবার আগেই সেটা হয়েছিল। তখন জনির স্বাস্থ্য খুব মজবুত ছিল। একদিন রিহার্সালে গিয়েছিলাম স্রেফ জনির বাজনা শুনব বলে। জনির সঙ্গে মিলেস ডেভিসও ছিলেন বাজানোর জন্য। স্যাক্সো বাজাতে সবারই ইচ্ছে করছিল। খুব খুশি সবাই। ভালো পোশাক পরে তারা চলাফেরা করছিল (কথাটা মনে পড়ল কারণ এখন বোধহয় উলটো করবে বলেই জনি এত নোংরা বিশ্রী পোশাকআশাক পরে)। সেদিন খুব আনন্দ করে বাজাচ্ছিল। ওর মধ্যে কোনো অস্থিরতা ছিল না। রেকর্ডিং করার ঘরের জানালার ওপারে থাকা শব্দ প্রেক্ষাপক ভদ্রলোক তৃপ্ত বেবুনের মতো খুশির ইশারা করছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে জনিকে দেখে মনে হচ্ছিল আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে। দুম করে বাজানো বন্ধ করে দিল। জানি না কার দিকে যেন মুঠো পাকিয়ে বলতে লাগল—'কাল এটা বাজাচ্ছি।' ব্যস অন্যরাও তখন মাঝপথে বাজনা থামিয়ে দিল। ট্রেনে ব্রেক কষবার পরেও যেমন ক'পা গড়াতে থাকে, ঠিক সেভাবে বড়জোর দু-একজন হয়তো পরের লাইনটা বাজিয়ে যাচ্ছিল। জনি কপাল চাপড়ে বলতে লাগল—'কাল তো এটা বাজালাম। এ ভয়ংকর। মিলেস এটা আমি কালই বাজিয়েছি।' অন্যরা তারপর আর বাজিয়ে যেতে পারছিল না। তারপর থেকে সবকিছু খারাপভাবে গড়াচ্ছিল। জনি অনিচ্ছাসহকারে বাজিয়ে চলছিল। বারবার উঠে যেতে চাইছিল। ('নির্ঘাত ড্রাগ নিয়েছে'—শব্দ প্রক্ষেপক রাগে অস্থির হয়ে বলে উঠলেন)। জনিকে তারপর যখন বেরিয়ে যেতে দেখলেন, এলোমেলো পা, মুখের ভাব সিন্ডারেলার মতো, নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম...আর কতক্ষণ এরকম চলবে।

—ভাবছিলাম ডক্টর বার্নার্ডকে ফোন করি—চিন্তিত মুখে জনির দিকে তাকিয়ে দেদে বলল। সে তখন ছোট ছোট চুমুকে রাম খাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে দেদে বলল—তোমার জ্বর, কিছু খেয়ো না।

—ডক্টর বার্নার্ড একটা ডিপ্রেসড লোক, বুদ্ধু—গ্লাস চাটতে চাটতে জনি বলল—প্রথমে অ্যাসপিরিন দেবে। তারপর বলবে জ্যাজ ওর দারুণ ভালো লাগে। এই যেমন রে নোব্লের বাজানো জ্যাজ বাজনা। ব্রুনো, ভালো একটা আইডিয়া দিলি। একটা স্যাক্সো যদি থাকত তাহলে ওকে মিউজিক বাজিয়ে বরণ করে

আনতাম। সেক্ষেত্রে ফের চারটে তলা নেমে গিয়ে লোকটা উঠে আসত। সিঁড়ির প্রতি ধাপ উঠবার সময় মিউজিকের তালে তালে পাছা দোলাত।

—যাই হোক অ্যাসপিরিন নিলে তোর কোনো ক্ষতি হবে না—গম্ভীর মুখে দেদেকে দেখতে দেখতে কথাটা বললাম জনিকে। চাইলে আমি একটা ফোন করতে পারি। দেদেকে তাহলে আর নিচে নামতে হবে না...শুনছিস? তবে ঐ চুক্তিটা...পরশু যদি ওটা শুরু করিস তাহলে মনে হয় না ও কিছু করতে পারবে। নইলে রোরি ফ্রেন্ড—এর থেকেও স্যাক্সো চাইবার চেষ্টা করতে পারি। সবচেয়ে বাজে হবে যদি...আসলে প্রশ্ন হলো...জনি তোকে অনেক সাবধানে হাঁটতে হবে।

—আজ না—রামের ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে বলল জনি—ওসব কাল হবে, সঙ্গে যখন স্যাক্সো থাকবে। জানি না এখন কেন এসব নিয়ে কথা বলছি। ব্রুনো, প্রত্যেকবার আমি ভালো করে খেয়াল করে দেখি যে সময়...আসলে বিশ্বাস করি সংগীত এসব বিষয় বুঝতে একটু বেশিই সাহায্য করে। ইয়ে, এসব ঠিক বুঝবার জন্য না, বরং সত্যি বলতে কী এগুলো কিছু বুঝিও না। একটা কাজই কেবল করি, সেটা হলো—খেয়াল করি। টের পাই কিছু একটা আছে। ওসব স্বপ্নটপ্নের মতো এটা নিশ্চিত নয় যে তোকে সন্দেহ করার ব্যাপারটাও যে কোথা থেকে শুরু হয়। তারপর ক্রমে সবকিছু কেন হারিয়ে যায়। এগোতে গেলে কেমন যেন সামান্য ভয় ভয় করে। আবার সেই সঙ্গে তুই একটু নিশ্চিতও হতে পারবি না। বড়জোর গোটা ব্যাপারটা কেমন প্যানকেকের মতো ডিগবাজি খাবে। পরমুহূর্তেই দেখলি যে তুই শুয়ে আছিস দুর্দান্ত এক সুন্দরীর সঙ্গে, সবকিছু এক্কেবারে স্বর্গের মতো নিখুঁত।

ঘরের এককোণে দেদে গ্লাস আর কাপগুলো ধুচ্ছে। দেখলাম ওর কল থেকে শুধু জলই পড়ছে না, সেখানে আবার একটা পাত্র আর একখানা ফুলদানিতে গোলাপফুল রাখা। ফুলদানিটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো স্টাফড পুতুল। আর জনি মুখে কম্বল আধচাপা দিয়ে কথা বলেই চলেছে। রামের প্রভাবে আর জ্বরের ধাক্কায় ওর কালো চকচকে মুখ একটু একটু করে ঘেমে উঠছিল।

—এ সবকিছু সম্বন্ধে আমি পড়েছি ব্রুনো। এটা খুব অদ্ভুত আর বাস্তবে এত কঠিন...। জানিস, আমার মনে হয় সংগীত এতে সাহায্য করে। সেটা ঠিক বুঝবার জন্য নয়, কেননা বাস্তবে তো আমি কিছুই বুঝি না।—হাত মুঠি করে কপালে একটা ঘুসি মারল। মাথায় ধাক্কা লেগে ঠিক নারকেলের মতো আওয়াজ হলো।—ভেতরে কিচ্ছু নেই, ব্রুনো, ও যা বলল সেরকম কিচ্ছু না। এ ব্যাপারে ও কিচ্ছু ভাবেওনি বোঝেওনি। সত্যি বলতে কী বুঝতে কখনো কসুরও করেনি অবশ্য। লোকের চোখ নামিয়ে রাখা স্বভাব থাকলে ঐ নামানো চোখ সম্পর্কে আমি বুঝতে শুরু করেছি। চোখ যত নিচু থাকে আমি তত ভালো বুঝতে পারি। আবার এটা যে সত্যিকারের বোঝা নয়, তাতেও আমি সহমত।

—তোমার জ্বর বাড়ছে তো—দেদে ওর কাপড়ের নিচ থেকে হাত টেনে আঁতকে বলে উঠল।

—শান্ত হও। এটা সত্যি ব্রুনো। আমি কক্ষনো কিছু নিয়ে ভাবিনি। কিন্তু হঠাৎই খেয়াল করলাম—কী ভাবছি। অথচ এটাতে তো হাসির কিছু নেই, তাই না? কারও যদি কোনো ভাবনাই থাকে বুঝি না তাতে হাসির কী ব্যাপার থাকে? সে তুই ভাবিস বা আর যেই ভাবুক—ব্যাপারটা তো একই। আমি নই, অথবা আমিই। সহজ ব্যাপার যেটা ভাবছি সেখান থেকে সুবিধা তুলে নিচ্ছি। তবে কাজ সবসময় পরে করছি। আর ওটাই আমি সহ্য করতে পারছি না। আহ...এটা কঠিন, বড্ড কঠিন...। ধুস গ্লাসে একফোঁটাও তলানি পড়ে নেই?

ওকে রামের শেষ তলানিটুকু দিলাম। ঠিক তখনই দেদে ঘরের আলোটা ফের জ্বালিয়ে দিল। ততক্ষণে খালি চোখে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না ফ্ল্যাটের ভেতর। জনি ঘামছে। কিন্তু তবুও কম্বল জড়িয়ে রেখেছে। খুব কম হলেও মাঝেমধ্যে কাঁপুনি দিয়ে উঠছে, তখন চেয়ার মড়মড় করে উঠছে।

—খেয়াল করে দেখছি ছোটবেলায় শিখতে শুরু করে খুব তাড়াতাড়ি স্যাক্সোফোন বাজাতে শিখে ফেলেছিলাম। আমাদের বাড়িতে সারাক্ষণই প্রায় গণ্ডগোল লেগেই থাকত। ধার বাকি কিংবা মর্টগেজ এসব ছাড়া কানে কিছুই আসত না। জানিস মর্টগেজ কী? নির্ঘাত ভয়ানক কিছু হবে। কারণ যতবার বুড়ো বাপ এই মর্টগেজের কথা বলত ততবার মাথার চুল টেনে টেনে ছিঁড়ত। সবকিছু শেষ হতো বুড়োবুড়ির মারামারিতে। তখন আমি বছর তেরোর হব...কিন্তু কানে তো সবই চলে আসে।

এসব শুনে থাকলে বেশ করেছি। জনির জীবনী লিখতে গিয়ে এসব যদি লিখেই থাকি তো বেশ করেছি।

—এ কারণে বাড়িতে সময় কাটতেই চাইত না জানিস? একটা ঝামেলা থেকে অন্য ঝামেলা...পরপর এসব চলতেই থাকত। খাওয়াদাওয়া প্রায় মাথায়। কিন্তু সবার ওপরে স্বভাব। সেটা তুই আন্দাজও করতে পারবি না। স্যাক্সোফোনটা স্যার যখন আমায় দিলেন সেটার হালত দেখলে হেসে মরে যেতি। তখন ভাবলাম জিনিসটাকে আরেকবার দেখি তো ভালো করে। কিন্তু বাজনাটা আমায় সময় ভুলিয়ে দিল। মানে আসলে এভাবে ছাড়া ঘটনাটা আর কোনোভাবে তো বলাই যায় না। জানতে চাস সত্যি সত্যি কেমন অনুভব করছিলাম? হয়তো সংগীত আমায় সময়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে তোকে বিশ্বাস করতে হবে এসময়ের কিছু আর দেখবার নেই আমাদের...ইয়ে...মানে আমাদের সঙ্গে, ব্যাপারটা যেমন করে বলা যায় আর কি।

একটু আগে জনির হ্যালুসিনেশন দেখতে পেলাম। যারা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ মানে নিজেই নিজের জীবন গড়ে তোলে, তাদের কথা মন দিয়ে শুনি। তবে তারা যা